সন্ধ্যার পরে

সন্ধ্যার পরে

মাহতাব হোসেন

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : চারু পিন্টু
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

Sondhyar Pore by **Mahatab Hossain**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2021
Price : 300.00
US $ 15
ISBN 978 984 95365 5 0

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http ://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https ://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http ://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http ://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭

http ://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http ://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

আমার বড়োবোন পারভীনকে
যার পাঠ্য পুস্তকের গল্প লুকিয়ে লুকিয়ে
পড়তে গিয়ে কখন
যে লেখার জগতে ঢুকে পড়েছি
টের পাইনি

কেটে যায় বোধ
পথে অবরোধ
ফিরবো না ঘরে
সন্ধ্যার পরে

তমাল বসা অবস্থা থেকে উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। ওরা আয়োজন করে ছুটে আসছে তমালের বারান্দার সামনে। খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ, দূরের দার্জিলিঙের পাহাড় থেকে ছুটে এসে এই ডাহুক নদীর ওপর শামিয়ানা টানাবে। তারপর বৃষ্টির উৎসব করে মুহূর্তেই উধাও হয়ে যাবে। মনেই হবে না যে একটু আগে বৃষ্টি হয়েছিল। তার বদলে ঝকঝকে সাদা পেঁজো মেঘে মেশানো নীল আকাশ দীর্ঘসময় ধরে ল্যান্ডস্কেপ ছবি হয়ে ঝুলে রইবে। আর নিচ দিয়ে পাথুরে ডাহুকের বুকে বয়ে যাবে সরসর শব্দে শীতল জল।

তমাল দোতলার এই টানাবারান্দার অর্ধেক পাঁচিল ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখতে চাইল আকাশের কী অবস্থা। দক্ষিণ দিকে মেঘ নেই, সামনের দিক থেকেই তুলোর মতো করে কালো কালো মেঘ উড়ে আসছে। উত্তরের আকাশেও কিছুটা মেঘ। আকাশের দিকে তাকাতেই চোখ নিচের দিকে, উত্তর দিক থেকে আসা ডাহুকের দিকে আটকে গেল। লাল জামা পরা এক কিশোরী। আশ্চর্য হেঁটে এসে মেয়েটা নদীর খাদে পাথরের দিকে নামতে শুরু করল। পেছনে একটা বালক। খুব বেশি দূর নয়, কিন্তু পরিষ্কারভাবে চেহারা চেনার জন্য এখান থেকে অনেকটাই দূর বটে। অনুমান করা যায় স্থানীয় কোনো মেয়ে নয়। এখানে কেন এই কিশোরী আর এই বালক? চিন্তা করল তমাল। ঢাকা বা বাইরে থেকে বেড়াতে এলে, তেঁতুলিয়া ডাকবাংলো এলাকায় আর তার আশেপাশের চা-বাগান দেখে ফিরে যায়।

তপন এসে পেছনে দাঁড়াল। সে এখানকার কেয়ারটেকার। বয়স বাইশ-তেইশ হবে। এখানেই থাকে। রান্নাবান্না করে, কটেজ

দেখাশোনা করে। এছাড়া তার আর তেমন কোনো কাজ নেই। তমালের মতো কিছু অতিথি এলে তপনের কাজ বেড়ে যায়। তপন কখন এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি। ওর দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল— 'কিরে বলে ফেল, দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

'কঁহোছো কী, দুপুরোত খাইবেন না, বেলা তো হয়া আইলো। আকাশোত ম্যাঘ দেখি কিছু বোঝা যাইছে না?'

তমাল উত্তর দিলো না। দূরে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কিংবা দূরের সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে সেদিকেই মনোযোগ দিলো। মেয়েটা এক পাথর থেকে আরেক পাথরে পা দিয়ে ধীরে ধীরে নদীর কিনারে নামছে। হালকা খরস্রোতা নদী, পানি নেই খুব বেশি একটা। একটু ভালো করে তাকালেই টলটলে পানির নিচের ছোটো ছোটো পাথর দেখা যায়।

তমাল চোখ সরিয়ে সামনের আকাশের দিকে তাকাল। ক্রমশ তারা সমবেত হচ্ছিল ডাহুকের ওপরে। হিমালয়ের মেঘ কীভাবে সীমান্ত পার হয়ে টুপ করে ঢুকে পড়ছে ভিনদেশে, কী বিচিত্র বিষয়। অবশ্য বিচিত্র ভাবলে অনেককিছুই বিচিত্র, এই ডাহুক নদীটা মাত্র কয়েক মাইল উত্তরে কাজি অ্যান্ড কাজি টি এস্টেটের পাশ দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে। আর এই যে তমাল এখন যেখানে আছে, চা-বাগানের দোতলা কটেজের এই পেছনের বারান্দায় দিয়ে কিছুটা দূর গিয়েই ভারতে ঢুকে পড়েছে। বাঁদিকে তো দূরত্ব ছাড়াই ভারতের সীমান্ত। তমালের উত্তরে ভারত, দক্ষিণে ভারত, সামনের পশ্চিমের কিছু মাইল সামনেও ভারত, সীমান্তের ওপারে, কার্শিয়াং, দার্জিলিং, তার ওপারে সিকিম।

'স্যার, ভাত দেইম?'

মেয়েলি কণ্ঠের আর্তচিৎকার মনে হলো। তপন ও তমাল একসঙ্গে নদীর সেই দিকটার দিকে তাকাল। ওখানে মেয়েটা ছিল, এখন নেই। ওর কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটা কি নদীতে পড়ে গেল? নদীতে পড়ে গেলে তো তলিয়ে যাওয়া সম্ভব না। ডাহুক নদীর এই

জায়গায় সেই অর্থে গভীরতা নেই। স্রোত রয়েছে, সেই স্রোতে তো ভেসে যাওয়া সম্ভব না। তবে সাঁতার না জানলে অনেককিছুই সম্ভব। একমুহূর্ত ভাবল তমাল। ওখানে বালকটাকে দেখা যাচ্ছে, সে দাঁড়িয়ে আছে। হাত-পা ছুড়ছে কিংবা চিৎকারের চেষ্টা করছে। স্পষ্ট নয় এতদূর থেকে।

তমাল দ্রুত দোতলা থেকে নেমে এলো। হাফপ্যান্ট ও টিশার্ট পরে ছিল সেভাবেই দৌড়াল। চা-বাগানের ভেতর দিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পৌঁছে গেল জায়গাটায়। মেয়েটা পড়ে আছে পাথরের ওপরে। এক পা পানিতে, পা থেকে রক্ত বের হয়ে প্রায় ভেসে যাচ্ছে।

না বুঝেই পিছু নিয়েছিল তপনও। তমাল কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। মেয়েটাকে সাপে কামড়েছে? প্রশ্নটা উঁকি দিলো মনে। তপন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'এটা কি সাপের কামড়?'

তমাল সাপের কথা উচ্চারণ করতেই তপন বলল—

'না স্যার, এই পাকে এই নদীত তেমন কোনো সাপ নাই। সাপ থাকিলে ঢোঁড়া সাপ থাকিবার পারে। এইটা সাপের কামড় নোহায়, তোরা ধরি তোলেন।'

চকিতে মেয়েটাকে দেখে নিল তমাল, জ্ঞান নেই। কী করবে এখন? কটেজে নিয়ে যাওয়ার কথাই ভাবল। বালক ছেলেটার চেহারা আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে। মেয়েটাকে ওরা দুজন মিলে তুলে ধরল।

তমাল বালকের দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, 'বাবু, ভয়ের কিছু নেই, তুমি আমাদের সঙ্গে আসো।'

মেয়েটাকে ধরাধরি করে দ্রুত ওরা কটেজে নিয়ে এলো।

পূর্ব দিকের একতলার বারান্দা চাটাইয়ের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। বেশ আগেই ফোঁটা ফোঁটা পড়তে শুরু করেছিল বৃষ্টি। এবার তুমুল বেগে নামল। বৃষ্টির তাণ্ডব কতক্ষণে থামবে কে জানে। তমালের ব্যাগে কিছু ফার্স্ট এইডের জিনিসপত্র থাকেই। তপনকে

বলতেই সে খুঁজে নিয়ে এলো সব। তমাল মেয়েটার গোড়ালির জায়গাটা চেপে ধরে রেখেছিল। হাত সরিয়ে দেখল রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে। কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথেই ফের রক্ত গড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

ক্ষত জায়গায় ভালো করে বেঁধে না দিলে ফাঁক হলেই রক্ত ফের বেরোতে শুরু করবে। সবকিছুই হাজির করেছে তপন। একটা পরিষ্কার বাটি, ডেটল, কটন, গজ ব্যান্ডেজ। তমাল ধরে ধীরে মেয়েটার ক্ষতস্থানটা ডেটল মেশানো পানি দিয়ে ধুইয়ে দিতে শুরু করল। ধারালো পাথর লেগে গোড়ালি কেটে গেছে। খুব বেশি নয়, তবে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ায় মেয়েটা সেন্সলেস হয়ে গেছে সম্ভবত, কিংবা পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত লেগেও সেন্সলেস হতে পারে। অনেকেই রক্ত সহ্য করতে পারে না।

তমাল একমুহূর্ত ভেবে নিল, আগে বি-ডিং বন্ধ করা দরকার। তারপর বাকিটা দেখা যাবে। আঘাত পাওয়া পায়ের জিনসের প্যান্ট ভাঁজ করে দুই ধাপ মুড়িয়ে দিলো। ধবধবে ফরসা পা রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে প্যান্টেও কিছুটা লেগেছিল কিন্তু পানিতে ভিজে গিয়ে বোঝা যাচ্ছে না তেমন। ভালো করে জায়গাটা মুছিয়ে দিয়ে তুলায় নেবানল ক্রিম ধীরে ধীরে লাগিয়ে, একটা পরিষ্কার তুলায় ক্রিম মাখিয়ে জায়গাটাকে বেঁধে দিলো।

না, আর রক্ত বেরোনোর চান্স আপাতত নেই। নির্বাক হয়ে বালকটা দেখছিল, ওর মুখ থেকে এখনো আতঙ্ক মুছে যায়নি। তপন এরই মধ্যে একটা বালিশ এনে মেয়েটার মাথার নিচে দিয়ে দিলো।

হাত ধুয়ে, তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে ছেলেটাকে কাছে টেনে নিল তমাল। বড়োজোর ৮ থেকে ৯ বছর হবে ওর।

'তোমার নাম কী?'

'আবির।'

'ও কে হয় তোমার?'

'আপু...'

‘ও। ভয়ের কিছু নেই। এখনই ঠিক হয়ে যাবে তোমার আপু।’

ছেলেটা মাথা নাড়ল। চেহারা থেকে আতঙ্কভাবটা কমতে শুর করেছে।

‘তোমরা থাকো কোথায়?’

‘ঢাকায়...।’

‘ঢাকায়? এখানে এলে কীভাবে?’

ছেলেটা কাঁদতে শুর করবে মনে হয়। চেহারায় কান্না উপস্থিত, শুধু একটা ঝোড়ো হাওয়া দরকার। হয়তো কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছে করছে না, কিংবা উত্তর জানা নেই তার। চোখের সামনে নিজের বোনের এই অবস্থা দেখলে কার মাথা ঠিক থাকে? তমাল ভাবল, প্রথমেই এদের স্বজনদের খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু বৃষ্টি না কমলে সে উপায় নেই।

বাইরে বৃষ্টি কমার লক্ষণ নেই। বৃষ্টির গতি আরো বেড়েছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাট বারান্দায় আসছে। মেয়েটাকে যেদিকে শুইয়ে রাখা হয়েছে তপন সেইদিকের রেলিঙের প-াস্টিকের পর্দা ফেলে দিয়েছে। মেয়েটা এখন স্বাভাবিকভাবেই ঘুমাচ্ছে মনে হচ্ছে। বুক ওঠানামা করছে। বয়স কত হবে, ১৮ বা ১৯ বা বড়োজোর মেরে কেটে ২২। তমাল দূর থেকে যখন খেয়াল করেছিল তখন স্কুলপড়ুয়া কিশোরীই মনে হয়েছিল। এই বয়সি মেয়েদের কাছে মোবাইল থাকা খুব স্বাভাবিক কিন্তু তমাল খেয়াল করেছে মেয়েটার পকেটে মোবাইল নেই।

বৃষ্টির তেজ আরো বাড়তে শুর করেছে। মেয়েটাকে নিয়ে চিন্ড্র হচ্ছে, এখনো জ্ঞান ফেরেনি। এই বৃষ্টিতে হাসপাতালে নেওয়া বা কোনো ডাক্তার ডাকারও উপায় নেই। যদিও মনে হচ্ছে খুব দ্র ত মেয়েটার জ্ঞান ফিরে আসবে। সৃষ্টিকর্তার কাছে সে প্রার্থনাই করছে তমাল। তপন আশপাশেই ঘোরাঘুরি করছিল।

‘তপন কাছাকাছি কোনো ডাক্তার পাওয়া যাবে?’

‘না দাদা, তেঁতুলিয়া বাজারোত যাবার লাগবে।’

মোটরসাইকেল নিয়ে সহজেই বাজারে যাওয়া যায়। ওদের কটেজ থেকে কিছুটা দূরেই ম্যানেজারের র ম। ম্যানেজারের র মে মোটরসাইকেল রয়েছে। আজ বাগানে শ্রমিকেরা আসেনি। ম্যানেজার এসে হয়তো ঘুমাচ্ছে। এমন ঝিম মারা আবহাওয়ায় সেটাই স্বাভাবিক।

নানা চিন্ড্রভাবনা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। আবির ছেলেটাকে নিয়েও চিন্ড্র হচ্ছে বোনের এই অবস্থায় সে চুপচাপ রয়েছে। কিন্তু ও যে ভালোরকম ভয় পেয়েছে বোঝা যাচ্ছে। বৃষ্টির সাথে বাতাসের ঝাপটা বারান্দায় আঘাত করল।

আর তক্ষুনি মেয়েটা মুখচোখ নাড়াল মনে হয়। তারপর চুপচাপ। এবার বৃষ্টির বড়ো একটা ছাট এসে বারান্দায় ধাক্কা মারল। রেলিঙে শব্দ হলো জোরে। মেয়েটার জ্ঞান ফিরে আসছে মনে হয়। একটু পরই, ধীরে ধীরে চোখ মেলে ক্লান্ড়ি নিয়ে চোখ খুলল। সাধারণত এই ধরনের ঘটনায় মানুষ প্রথমেই বিস্মিত হয়, বোঝার চেষ্টা করে সে কোথায়। মেয়েটা শোয়া অবস্থাতেই মাথা ঘুরিয়ে তমালের চোখের দিকে তাকাল। তমালের একটু অস্বস্ড়ি হলেও বুকে চেপে থাকা ভারটা নেমে গেল। অনেকটা আকস্মিক হালকা ও আনন্দদায়ক অনুভূতি হচ্ছে।

‘ঠিক আছেন?’

মেয়েটা কথা বলল না। শুয়ে থাকা অবস্থাতেই পায়ের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল। চোখেমুখে ব্যথার ছাপ ফুটে উঠল। তমাল এগিয়ে গেল।

‘আপনার মাথায় আঘাত লাগেনি তো?’

মেয়েটা মাথায় হাত দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল। তারপর শান্ড় গলায় বলল, ‘না।’

উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে আবিরের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এই আবির আমার ফোন?’

আবির মাথা নাড়ল। যার অর্থ সে জানে না। তমাল বলল,

'আপনার সঙ্গে ফোন ছিল?'

'হ্যাঁ ছিল তো।'

গলায় ক্লান্তি ও বিরক্তি মিশিয়ে খুব ধীরে ধীরে বলল।

'আচ্ছা, আপনার ওঠার দরকার নেই, আপনি শুয়ে থাকুন। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে।'

মেয়েটা বাধ্য মেয়ের মতো শুয়ে থাকল কিন্তু চোখ স্থির রইল তমালের চোখে। হয়তো বোঝার চেষ্টা করছে লোকটা কে? নিশ্চয় খারাপ ভাবেনি। মেয়েদের নাকি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি থাকে, খুব সহজেই পুরুষের প্রাথমিক ভালো ও মন্দটা বুঝে যায়। এসব তমালদের আড্ডার কথা। তার কতটুকু সত্য মিথ্যা যাচাই করার চেষ্টা করেনি। তার জীবনে ইতিবাচক বিষয়গুলোই নেতিবাচকভাবে এসেছে। মেয়েটা ইশারা করল, পানি খাবে।

'তপন, পরিষ্কার করে একটা মগে পানি নিয়ে এসো।'

তপন পানি নিয়ে এলো। মেয়েটা ধীরে ধীরে উঠে বসে মগের পানি অর্ধেক খেয়ে রেখে দিলো।

'আমি এখন যেতে পারব?'

'একা যেতে পারবেন না। বৃষ্টি কমুক, আপনার ঠিকানায় পৌঁছে দেবো। তাছাড়া আপনার পা নাড়ানো যাবে না। সতর্কভাবে মুভ করতে হবে। কোনোভাবে ব্যান্ডেজ করে ব্লিডিং বন্ধ করা গেছে। আবার ব্লিডিং হলে ঝামেলা হয়ে যাবে।'

মেয়েটা আর কথা বলল না। তমালের নির্দেশ আজ্ঞাবহ মেনে নিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল।

'আপনার নামটা জানা হলো না।'

প্রশ্নটা তমালের নিজের কাছেই বোকা বোকা লাগল। এই সময় নাম জানতে চাওয়াটা জরুরি নয়। সুস্থবোধ হলে নিকটস্থ ঠিকানা জানাটাই সমীচীন। তবে মেয়েটা স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিলো।

'অহনা। পাশের তেঁতুলিয়া টি কোম্পানি লিমিটেড আমাদের।'

অনেকটা সাবলীল কণ্ঠ। অল্প সময়েই মেয়েটা নিজেকে সামলে

নিয়েছে। যাক ভয়টা কেটে গেছে। এখন মেঘটা কেটে গেলেই হয়।

'ওঃ, তাহলে তো কাছেই। বৃষ্টি কমলেই আপনাকে পৌঁছে দেবো, একদম চিন্তা করবেন না।'

তমাল বারান্দার লোহার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। মেঘ সরে যাচ্ছে, হিমালয়ের মেঘ বাংলাদেশে বৃষ্টি দিয়ে ভারতের দিকে চলে যাচ্ছে। কী অদ্ভুত! এখানের হিসেবনিকেশগুলোই অদ্ভুত, বিস্ময়মেশানো। বৃষ্টি কমতে শুরু করেছে।

দামি একটা গাড়ি এসে থামল ওদের কটেজের সামনে। তার আগেই একজন শ্রমিক টাইপের লোক ছাতা নিয়ে বাইরে গাড়ির ড্রাইভিং দরজার কাছে দাঁড়াল। দরজা খুলে নেমে এলেন অভিজাত চেহারার ভদ্রলোক। ছাতাওয়ালা লোকটার মাথায় ছাতা ধরল। পেছনের দুই দরজা দিয়ে দুজন অস্ত্রধারী আনসার বা সিকিউরিটি বৃষ্টি উপেক্ষা করেই লোকটার পাশে এসে দাঁড়াল।

একটা ছিপনৌকার একদিকে বসে আছে নোভা। সুতির শাড়ি পরেছে, সাদা ধবধবে ব-াউজ, লম্বা হাতা। চুল ছেড়ে দিয়ে নৌকার পেছন দিকে হেলান দিয়েছে নোভা। মেয়েটা দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে গেল। সমুদ্র ধীরে ধীরে বইঠা দিয়ে নৌকাটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে। নোভা অকারণে খলখল করে হেসে উঠছে। জলের সঙ্গে হাসির শব্দ মিশে একটা অপরিচিত শব্দ তৈরি হচ্ছে। এই শব্দের সঙ্গে সমুদ্র পরিচিত নয়। সে এক জীবনে অনেক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে, বিচিত্ররকম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে আবার খুব কাছের অনেক ব্যাপারও তার অজানা থেকে গেছে। এই যেমন টিনএজের শেষের দিকের মেয়েদের অকারণ হাসি, অভিমানের কারণ সে ধরতে পারে না।

নোভা মাঝে মধ্যেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে কীসব করে, কান্নাকাটিও নাকি করে। ফের অকারণ ব্যস্ড় সমস্ড় সবার জন্য আনন্দদায়ক কিছু করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। শান্ড়র কাছে শুনেছে সে। কেননা নোভা এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তাকে আর পড়াতে যায় না সমুদ্র। এটা নদী কি না হাওড় বোঝা যাচ্ছে না। নৌকা একটা ছোট্ট দ্বীপের মতো জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় নোভা চেঁচিয়ে উঠল—
'এই সমুদা...'

বইঠা মারা থামিয়ে সমুদ্র নোভার মুখের দিকে তাকাল...

'কী হলো?'

'এখানে নামব...'

'এখানে আবার নামার কী হলো?'

'না না, একটু নামব দেখো না, কত সুন্দর জায়গাটা...'

সমুদ্র নৌকাটা ভেড়ায়। একদম কাছে। যতটা ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়েছিল তেমন নয়। কিছু কলমি আর কচুরিপনা দিয়ে তীরের দিকটা তারপরেই কিছুটা শুকনো মাটি। নলখাগড়া দিয়ে অনেকাংশ পরিপূর্ণ ডাঙামতো জায়গাটা। নৌকা ভিড়িয়ে সমুদ্র নোভার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাবধানে নামো...'

'কেন?'

'কাদা আছে, শাড়িতে লেপটে যাবে।'

'কোথায় কাদা দেখছ?'

নোভা লাফিয়ে পড়ে দ্বীপের মতো জায়গাটাতে। কয়েকটা বক আর অপরিচিত কিছু পাখি ছিল, সেসব উড়ে গেল। নোভা দৌড়ে গিয়ে একটা বককে প্রায় ধরেই ফেলেছিল। শেষ পর্যন্ড় হাত ফসকে যায়। সমুদ্র নৌকাতেই বসে ছিল। নোভা আনন্দে কয়েক পাক খেয়ে নিল। আসলেই জায়গাটা সুন্দর, কিন্তু খুব ছোটো হওয়ায় এখানে খুব সম্ভবত মানুষজন আসে না। নোভা চেঁচিয়ে বলল, 'এই সমুদা, জায়গাটা খুব সুন্দর। তুমি এত সুন্দর জায়গায় কেন আমাকে নিয়ে এসেছ...?'

চিৎকার করে এমন প্রশ্ন করলে লজ্জা লাগাটাই স্বাভাবিক। সমুদ্র আশেপাশে সন্ড়র্পণে তাকায়, কেউ শুনল কি না। না কোথাও কেউ নেই। চারদিকে পানি আর পানি, কোনো স্রোত নেই। নেই একটা মানুষও। এই দ্বীপের মতো মাটিটুকু ছাড়া আর কোনো মাটি, গাছপালাও চোখে পড়ছে না। মিনিট কয়েক পরেই নোভার উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়ে এলো। তারপর সে ফিরে এলো নৌকার কাছে।

'সমুদা, চলো...'

'আগ্রহ শেষ?'

'আরে বেশি সুন্দর জিনিস বেশিক্ষণ উপভোগ করতে হয় না, তেতো লাগে। চলো তো...'

'উঠে এসো।'

নোভা নোকায় উঠে আসতেই একটু দোল খেলো, না তেমন

ঝামেলা হলো না। ব্যালান্স হয়ে গেল নৌকাটা। আসলে বইঠাটা মাটিতে চেপে ধরার কারণে টাল সামলানো গেল বলা যায়। মাটির কাছ থেকে ধীরে ধীরে নৌকাটাকে বেশি পানির মধ্যে নিয়ে এলো সমুদ্র। চারদিক থইথই করছে পানি। নিজের নামের সাথেই চারদিকটা মিলে গেছে। কিন্তু ঢেউ না-থাকায় পুরোপুরি মিল পাওয়া যাচ্ছে না।

সমুদ্র ফের বইঠা দিয়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে নৌকাটাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। হালকা চাপা গলায় নোভা একটা গান শুর করল। এবার গানের মিউজিক হিসেবে দারুণ মানিয়ে যাচ্ছে বইঠা ঠ্যালার শব্দ। নোভা বেশ হেলেদুলে গাইছে। নৌকা সামান্য দুলছে। সমুদ্র ভাবল নোভাকে দুলতে নিষেধ করবে। বলতে না বলতেই কোত্থেকে একটা বড়ো জাহাজ চলে এলো। জাহাজের ঢেউয়ে ওদের নৌকাটা প্রায় তাল হারিয়ে ফেলল, নোভা চিৎকার শুর করেছে, সমুদ্র বলল...

'না না, তুমি এগিয়ে আসো, আমার হাতটা ধরো, আমার হাতটা ধরো...'

ঘুম ভেঙে গেল সমুদ্রের। সামনে এক কিশোরী দাঁড়িয়ে আছে। সালোয়ার-কামিজ পরা। পেছনে লম্বা চুল ছেড়ে দেওয়া। নোভার মতোই মুখের গড়ন মনে হচ্ছে। সমুদ্র বোঝার চেষ্টা করল সে আসলে কোথায়। হাসিহাসি মুখ করে কিশোরী বলল, 'স্বপ্ন দেখছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ, মানে...'

সমুদ্র স্বপ্ন দেখছিল। লজ্জা পেল অপরিচিত এই কিশোরীর সামনে। স্বপ্নটা একদম পরিষ্কার। এত জীবন্ত স্বপ্ন হয়? তাও নোভাকে নিয়ে, কী আজব! স্বপ্নতে নাকি রং থাকে না, কোথায় যেন শুনেছিল। কিন্তু নোভা একটা কালো শাড়ি আর সাদা রঙের ব-াউজ পরে ছিল। একদম সজীব। কিশোরী বলল, 'আচ্ছা আপনি উঠে ফ্রেশ হয়ে নিন। ঢাকা শহরের বাড়িগুলোর মতো অ্যাটাচ্ড বাথরম নেই। বাইরে কলপাড় আছে। সেখানে সব ব্যবস্থা আছে।'

মেয়েটা চলে যেতে গিয়েও ফিরে এসে বলল, 'ভাইয়া, একটু

বাইরে গেছে। আপনি যে-কোনো প্রয়োজনে আমাদের কাজের লোককে বললেই হবে। আমিও বাড়িতেই আছি, প্রয়োজন মনে করলে ডাকবেন।'

'তুমি সোহানের বোন?'

'হ্যাঁ। কেন ভাইয়া আপনাকে আমার কথা কখনো বলেনি?'

'হ্যাঁ, মানে আমার মনে ছিল না।'

'সমস্যা নেই। মাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন। ঘুম ঠিক হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঘুম ঠিক হয়েছে।'

'আমার নামও মনে হয় মনে নেই তাই না?'

'উম... মনে করতে পারছি না।'

সমুদ্র একটা স্যান্ডো গেঞ্জি আর ট্রাউজার পরে ঘুমিয়েছিল। নিজের দিকে খেয়াল করে ফের লজ্জা পেল। কিশোরী হয়তো ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারল। কিছু বিষয় হয়তো অনুমান করলেও উপেক্ষা করতে হয়, তেমন করেই উপেক্ষা করে বলল, 'আমার নাম সুমনা।'